ষাট বছর আগের সেই বর্ষামঙ্গল ঃ প্রাক্তনীদের বর্ষামঙ্গল

প্রেসিডেন্সি কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন ১৫ শ্রাবণ ১৪০৬ (১ আগস্ট ১৯৯৯) সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় কলকাতার রোটারি সদন (৯৪/২ জওহরলাল নেহরু রোড) সভাগৃহে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান গেয়ে বর্ষামঙ্গল উদ্‌যাপন করে। সভাগৃহ পূর্ণ ছিল।

সভার সূচনা করেন সভাপতি প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র। সমিতির দীপিকা মজুমদার, পার্থসারথি সেনগুপ্ত এবং জ্যোর্তিময় পালচৌধুরী সমিতির এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য এবং আশু ভবিষ্যতের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে প্রাক্তনীদের অবহিত করেন। সভাশেষে প্রণবশঙ্কর মুখোপাধ্যায় শিল্পী ও অতিথিদের ধন্যবাদ জানান। সভা ভাঙ্গলে প্রাক্তনীরা জলযোগের সঙ্গে পুরনো বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পরিচয় ঝালিয়ে নেন।

অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন শঙ্খ ঘোষ (বাংলা ১৯৪৭-৫১), বিভাস চক্রবর্তী (ভূগোল ১৯৫৩-৫৭), চিত্রলেখা চৌধুরী (পদার্থবিদ্যা ১৯৫৪-৫৭), দীপক রুদ্র (অর্থনীতি ১৯৫৭-৬১), মধুমন্তী মৈত্র (ইংরেজি ১৯৮২-৮৭), রাজশ্রী ভট্টাচার্য (১৯৮৮-৯১)। সমবেত সঙ্গীতে যোগ দিয়েছিলেন উত্তরায়ণ সংস্থার শিল্পীরা।

অনুষ্ঠানের আরম্ভে শঙ্খ ঘোষ জানান ঃ

"আজ আমাদের এখানে বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠান হচ্ছে। আজ থেকে ঠিক ষাট বছর আগে এরকম এক পয়লা আগস্ট একটি গান লেখা হয়েছিল, এসো গো জ্বেলে দিয়ে যাও প্রদীপখানি। এই গানটি লেখার আগের কয়েকদিন আর পরের কয়েকদিন পরপর কয়েকটি দিনের মধ্যে বেশ কিছু গান লেখা হয়ে গেল বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানের জন্য—১৯৩৯ সালের বর্ষামঙ্গল। একটা মজার ব্যাপার হলো যে, সেই বছর রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, আর একটিও নতুন গান লেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু তাঁর সঙ্গে যাঁরা ছিলেন,—শৈলজারঞ্জন মজুমদার প্রধানত, সুধীরচন্দ্র কর,—এঁরা পরে অনেকবার বলেছেন এবং লিখেছেন কীভাবে যিনি বলেছিলেন একটিও গান লেখা সম্ভব নয় তাঁকে দিয়ে ছিল করে নানারকম কথা বলে, উশ্‌কে দিয়ে, একটির পর একটির পর একটি গান লিখিয়ে নিচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত পনেরোটি গান লেখা হয়ে গেল। বস্তুত, এক ঝোঁকে এতগুলি গান লেখা রবীন্দ্রনাথের সেই শেষবার।

"সেই পনেরোটা গানের পর ওঁদের মনে হয়েছিল, ষোলো কলা পূর্ণ হলো না, আরেকটা গান হলে ভালো হত। কিন্তু সেটা রবীন্দ্রনাথ লিখে উঠতে পারেন নি। গান হয়েছিল ষোলোটাই। দুবছর আগে আর একটা বর্ষামঙ্গল, সেখান থেকে একটি গান সংগ্রহ করে নেওয়া হয়েছিল—আমার যেদিন ভেসে গেছে। পনেরোটা গান আর এই গানটি—সেই ষোলোটি দিয়ে, ১৯৩৯ সালে সেই যে বর্ষামঙ্গলের অনুষ্ঠান হয়েছিল, আমরা ভেবেছিলাম যে, আজকে সেইটারই একটা নতুন চেহারা দেওয়া হবে। এটা মনে হয়েছিল আরো এইজন্য যে শৈলজারঞ্জন অনেক সময়ে এটা তো বলতেনই,—মনে হয় আজকের অনেকে হয়তো কেউ কেউ সেই অনুষ্ঠান শুনেও ছিলেন—, রবীন্দ্রসদনের সেই অনুষ্ঠানে যেখানে শৈলজারঞ্জন তাঁর ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে এই গানগুলি পর পর গাইয়েছিলেন। কীভাবে তিনি রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে লিখিয়েছিলেন সেই কথাগুলি বলতে বলতে সেই গানগুলি গাইয়েছিলেন। তিনি নিজেও গেয়েছিলেন, বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল। এই গানটি সেদিন শৈলজারঞ্জন নিজে গেয়েছিলেন। খুব ছোটোবেলা থেকে বহুবার শুনেছি এই গান। কিন্তু জীবনের প্রান্তে এসে শৈলজারঞ্জন যখন রবীন্দ্রসদনে গাইছিলেন তখন অন্তত আমার মনে হয়েছিল জীবনে এই প্রথম গানটি শুনছি।

"ঠিক যেভাবে সেই অনুষ্ঠানটি হয়েছিল নানারকম ব্যবহারিক অসুবিধার জন্য আমাদের আজকের অনুষ্ঠান একেবারে সেইভাবে যে হচ্ছে তা নয়। ষোলোটা গান হবে, কিন্তু যে পরম্পরায় গানগুলো হয়েছিল সেই পরম্পরায় নয়। একটু অন্যভাবে সাজাতে হয়েছে। আর, তার সঙ্গে দুয়েকটি কবিতার টুকরো জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সেইভাবে গাওয়া হবে।

"১৮৯২ সালে রবীন্দ্রনাথের যখন একত্রিশ বছর বয়স মাত্র তখন একটা চিঠিতে ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন তিনি, পরমায়ুর মধ্যে এরকম আষাঢ়ের প্রথম দিন আর কবারই বা আসবে, সবগুলো কুড়িয়ে যদি ত্রিশটি দিন হয় তাহলেও বলতে হবে খুব দীর্ঘ জীবন হলো। ১৮৯২-এর পর সেই তিরিশটি বছর হতে যাচ্ছে তখন ১৯২১ সালে বর্ষামঙ্গল খুব বড়ো মাপের হয়েছিল। তারপর এটা একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৯৪০-এও হয়েছিল, তবে সেবার নতুন গান মাত্র একটিই হয়েছিল। সেই চিঠিটাতে একটা কথা রবীন্দ্রনাথ শেষে বলেছিলেন—কালিদাসের দিন, মেঘদূতের দিন, আমাদের ভারতবর্ষের বর্ষার চিরকালীন প্রথম দিন জীবনের মধ্যে আর কটাই বা পাব ; যখনই একথাটা মনে হয় তখন এই পৃথিবীর দিকে আর একবার তাকিয়ে দেখতে খুব হচ্ছে করে ; ইচ্ছে করে প্রত্যেকটা সূর্যোদয়কে সজ্ঞানভাবে অভিবাদন করে যাই, প্রত্যেকটি সূর্যাস্তকে পরিচিত বন্ধুর মতো বিদায় দিয়ে যাই। এই অভিবাদন করে নেওয়া আর বিদায়

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

দেওয়া, আর একটা দিন আমার জীবন থেকে চলে গেল, আর একটা বর্ষা আমার জীবন থেকে চলে গেল, এই কথাটা ভাবতে গেলেই এই পৃথিবীটাকে একটা অন্য রকম চেহারায় দেখতে পাওয়া যায়।

"আমাদের এই অনুষ্ঠান আজ হয়তো খুব ভালো নাও হতে পারে। আগেই বলেছি যে কিছু অব্যবস্থা আছে। কিন্তু আমরা এইটুকু বলতে পারি, এই বর্ষার গানগুলির মধ্য দিয়ে, আজকের এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে, আমরাও বলতে পারি, আর একটা বর্ষাকে আমরা অভিবাদন জানালুম, আর একটা বর্ষাকে আমাদের জীবনের মধ্য থেকে পরিচিত বন্ধুর মতো বিদায় দিতে যাচ্ছি।

"যে লেখাগুলোর কথা বলেছিলাম, সুধীরচন্দ্র করের সেই বিবরণ পড়ে শোনাবেন বিভাস চক্রবর্তী।"

পাঠ (বিভাস চক্রবর্তী)

১৩৪৬ সালের শ্রাবণ। বর্ষামঙ্গলের দেরি হচ্ছে। আর দেরি করা চলে না। কিন্তু কবির ভাণ্ডার শূন্য। নূতন গানের রণন নেই। উৎসবের উৎসাহেও মন্দা। কিন্তু রীতি তো রক্ষা করতেই হবে। কবির কথামতোই মহড়া বসল। বর্ষার পুরনো গান। শৈলজাবাবু শেখাতে লাগলেন। 'নাট্যঘর'-এ কদিন মহড়া চলছে। ভালো লাগছে না। 'আষাঢ়, কোথা হতে আজ পেলি ছাড়া', 'শ্রাবণ, তুমি বাতাসে কার আভাস পেলে'—এসব গানে আর মন ভরছে না। কবি যখন থাকবেন না, তখন না হয় পুরোনো নিয়েই চলবে। তিনি থাকতেও কি তাই হবে? নূতন না হলে চলবে না। কবিকে বলা হল—এবার ধর্মঘট হবে। জীর্ণদেহ, ক্লান্ত কবি ; বেশি ক্লান্ত বোধহয় গানেরই রিক্ততায়। কিছুতে আসছে না যে, বেজে উঠছে না সুর। বললেন—নাঃ, এবার আর পারব না, ও দিয়েই চালিয়ে দাও। কিন্তু দাবি চলতে লাগল—গান চাই। অবশেষে একটি গান তৈরি হল—ওগো সাঁওতালি ছেলে।

এক পশলা বৃষ্টি দীর্ঘ অনাবৃষ্টির পরে আনে রস-প্লাবন, শুষ্কতা দেয় ঘুচিয়ে। একটু সুরের হাওয়া, সুরধুনীর দোলা জাগালো মনে। এল গান—'বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল'। তারপরে একটানা এল চার-পাঁচটি। পুরোনো গানের ছাঁটাই চলতে লাগল, মহড়া জমতে লাগল নূতনে। আটদশটি যেই হল, চার দিকে রব তুলে দেওয়া গেল—এবার শুধু নূতন গানেই হবে বর্ষামঙ্গল উৎসব। একটা সাড়া পড়ে গেল। গুরুদেব প্রতিবাদ করে উঠলেন—না, না। যা তৈরি হয়েছে তার বেশি আর হবে না। আবেদন হল—একটু রাগিনীর বৈচিত্র্য হলে মন্দ হত না। বোধহয় কথাটা মনে ধরল। উৎপাতকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন বেহাগের পরম ভক্ত। গুরুদেব তা জানতে পারলেন। তৈরি হল ঃ

আজি তোমায় আবার চাই শুনাবারে
যে কথা শুনায়েছি বারে বারে।

আরেকজন—মুখে রা নেই, কিন্তু এদিকে বল্‌গা মানে না মানে দাবি। গুরুদেবের বুঝতে বাকি রইল না। তিনি জানতেন,—অন্যজন গানের গুণী ; ভৈরবী, ইমন, মল্লার, কাফি, কানাড়া—নানা মার্গ সুরে তাঁর রুচি। গুরুদেব অগত্যা আরো গোটা কয়েক গান রচনা করলেন। আড়ালে আবার চলল গবেষণা। বের করা গেল গুরুদেবের গানে বাগেশ্রী বেশি নেই। বলা হল সেকথা। পরদিনই দাবি পুরল 'সঘন গহন রাত্রি ঝরিছে শ্রাবণ-ধারা' গানে। তারপরে যেন একেবারে পড়ল ছেদ, অন্তত গুরুদেবের আকারে-ইঙ্গিতে এমনি ভাব।

কিন্তু এদিকে যে আসলই বাকি,—বাউল। এবারে যে বাউল সুরই নেই। আসর জমবে কী দিয়ে?

কথাটা জানানোর সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু কবিমনের একতারা উঠল বেজে, গান বেরিয়ে এল—'পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে, পাগল আমার মন জেগে উঠে'।

একটি নয়, দুটি নয়, চোদ্দটি নূতন গান হয়েছে—আর কথা চলে না। মরিয়া হয়ে শেষ দাবি করা গেল—ষোলো কলা পূর্ণ হতে যে আর সামান্যই বাকি। তখন শেষ গানটি পাওয়া গেল—ওগো তুমি পঞ্চদশী পৌঁছিলে পূর্ণিমাতে।

ষোলো পূর্ণ হল না, কিন্তু ক্ষোভেরও কিছু রইল না। সকলের উল্লাসের মধ্যে রাত্রিতে নূতন গানের মহড়া জমতে লাগল, আর নাট্যঘরে নয়, এবার কবিরই 'পুনশ্চ' গৃহে। সেই শেষবার নূতন গানের বন্যা নেবে এসেছিল।

আবৃত্তি (মধুমন্তী মৈত্র)

তাপিত আকাশে
হঠাৎ নীরবে চলে আসে
একটি করুণ ক্ষীণ স্নিগ্ধ বায়ুধারা,
কে অভিসারিণী যেন পথে এসে পায় না কিনারা।
অকস্মাৎ কোমলের কমলমালার স্পর্শ লেগে
শান্তের চিত্তের প্রতি অহেতু উদ্‌বেগে
ভ্রূকুটিয়া ওঠে কালো মেঘে ;
বিদ্যুৎ বিচ্ছুরি উঠে দিগন্তের ভালে,
রোমাঞ্চ কম্পন লাগে অশ্বত্থের ত্রস্ত ডালে-ডালে ;

সমবেত সঙ্গীত

আজি ঝরঝর মুখর
স্বপ্নে আমার মনে হলো

একক সঙ্গীত (রাজশ্রী ভট্টাচার্য)

ওগো সাঁওতালি ছেলে
আজি তোমায় আবার
শেষ গানেরই রেশ নিয়ে
ওগো তুমি পঞ্চদশী
নিবিড় মেঘের ছায়ায়

আবৃত্তি (মধুমন্তী মৈত্র)

বাদল আঁধার মাতালো তোমার হিয়া,
বাঁকা বিদ্যুৎ চোখে উঠে চমকিয়া।

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

চিরজনমের শ্যামলী তোমার প্রিয়া
আজি এ বিরহ-দীপন-দীপিকা
পাঠালো তোমারে এ কোন্ লিপিকা,
লিখিল নিখিল আঁখির কাজল দিয়া
চিরজনমের শ্যামলী তোমার প্রিয়া

মনে পড়িল কি ঘন কালো এলোচুলে
অগুরু ধূপের গন্ধ ?
শিখিপুচ্ছের পাখা সাথে দুলে দুলে
কাঁকন-দোলন ছন্দ?
মনে পড়িল কি নীল নদীজলে
ঘন শ্রাবণের ছায়া ছলছলে
মিলি মিলি সেই জল-কলকলে
কলালাপ মৃদুমন্দ ?
স্থকিত-পায়ের চলা দ্বিধাহত,
ভীরু নয়নের পল্লব নত,
না-বলা কথার আভাসের মতো
নীলাম্বরের প্রতি?
মনে পড়িছে কি কাঁখে তুলি ঝারি
তরুতলে-তলে ঢেলে চলে বারি,
সেচনশিথিল বাহু দুটি তারি
ব্যথার আলসে ক্লান্ত?

একক সঙ্গীত (দীপক রুদ্র)

এসো গো জ্বেলে দিয়ে যাও
এসেছিলে তবু আস নাই
এসেছিনু দ্বারে তব
আজি মেঘ কেটে গেছে

আবৃত্তি (মধুমন্তী মৈত্র)

শ্রাবণ সে চলে যায় পান্থ,
কৃশতনু ক্লান্ত,
উড়ে পড়ে উত্তরী-প্রতি
উত্তর-পবনে
যূথীগুলি সকরুণ গন্ধে
আজি তারি বন্দে,
নীপবন মর্মর ছন্দে
জাগে তার স্তবনে।
শ্যামঘন তমালের কুঞ্জে
পল্লবপুঞ্জে।
আজি শেষ মল্লার গুঞ্জে
বিচ্ছেদগীতিকা,
আজি মেঘ বর্ষণরিক্ত
নিঃশেষবিত্ত,
দিল করি শেষ অভিষিক্ত
কিংশুকবীথিকা

একক সঙ্গীত (চিত্রলেখা চৌধুরী)

বাদল দিনের প্রথম
সঘন গহন রাত্রি
পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে
আমার যেদিন ভেসে গেছে

সমবেত সঙ্গীত

আজ শ্রাবণের গগনের গায় ■

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073